পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

সৃষ্টির সব জীবের জীবনধারণের জন্য পানি অপরিহার্য। পানি শুধু পান করার জন্য নয়; বহুবিধ কাজের প্রধান উপকরণ। সারা বিশ্বে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।পৃথিবীতে প্রাপ্ত মিষ্টি পানির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই খাদ্য উৎপাদনে কৃষকরা ব্যবহার করেন। শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করা হয় প্রায় ২০ ভাগ এবং শতকরা ১০ ভাগ মিষ্টি পানি ব্যবহার করা হয় ঘরের কাজে।অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ পানি ব্যবহার করা হচ্ছে,অন্যদিকে অপরিশোধিত ও পয়ঃবর্জ্য ফেলে ভয়াবহ পানিদূষণ করা হচ্ছে। বিশ্বে এখনও ৭৪ কোটি ৮০ লাখ মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না। ভূপৃষ্ঠের ৭০.৯ শতাংশ অংশজুড়ে পানির অবস্থান। পৃথিবীতে প্রাপ্ত পানির ৯৬.৫ শতাংশ পাওয়া যায় মহাসাগরে। ১.৭ শতাংশ পাওয়া যায় ভূগর্ভে। ১.৭ শতাংশ পাওয়া যায় হিমশৈল ও তুষার হিসাবে। সামান্য কিছু পাওয়া যায় অন্যান্য বড় জলাশয়ে। আর ০.০০১ শতাংশ পাওয়া যায় বায়ুমন্ডলে অবস্থিত মেঘ, জলীয়বাষ্প, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত ইত্যাদিরূপে । পৃথিবীর পানির মাত্র ২.৭ শতাংশ হলো বিশুদ্ধ পানি এবং বাকি ৯৭.৩ শতাংশ হলো ভূগর্ভস্থ পানি ও বরফ। বিশুদ্ধ পানির ০.৩ শতাংশেরও কম অংশ পাওয়া যায় নদীতে, হ্রদে ও বায়ুমন্ডলে।

ভবিষ্যতের পানির চাহিদাগুলি পূরণ করার সক্ষমতার সাথে আপস না করে বর্তমান,পরিবেশগত,সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চাহিদাগুলি পূরণ করে পানি ব্যবহার করাই টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা ।নিরাপদ পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থায় বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। খোলা স্থানে মলত্যাগের হার প্রায় শূন্যের কোঠায় এসেছে,যা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগেই আমাদের এ অর্জন।আগে মানুষ উন্মুক্ত জলাশয় থেকে খাওয়ার পানি সংগ্রহ করত। এখন অধিকাংশ মানুষ নলকূপ থেকে খাওয়ার পানি সংগ্রহ করে। এ ক্ষেত্রে ৯৭ শতাংশ সফল হয়েছে বাংলাদেশ।

প্রকৃতি ও প্রাণের জন্য বদ্বীপ পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নদী ও জলাভূমিগুলোকে রক্ষা করতে হবে। নদী রক্ষার জন্য উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার,নদী ও জলাশয় ভরাট ও দখল থেকে মুক্ত করতে সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে । বাংলাদেশে প্রযুক্তিনির্ভর নদীর তথ্য পদ্ধতি উন্নত করার মাধ্যমে নদীর পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা জানা যাবে এবং সহজেই নদীর সমস্যাগুলো শনাক্ত করা যাবে। এতে করে সহজে নদী ও জলাভূমি রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়া যাবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে 'যৌথ নদী কমিশন' গঠন করে প্রথম পানি কূটনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেন। স্বাধীনতা লাভের পরপরই তিনি নদীর নাব্য সংকট দূরীকরণে ড্রেজার সংগ্রহ করেন। এ ছাড়া নৌপথ উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৫ সালে দেশে 'ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম' প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে Water Pollution Control Ordinance, ১৯৭৩ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সূচনা করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু বৃক্ষরোপণের যে ডাক দিয়েছিলেন, তাঁর এই দূরদর্শী ভাবনা বর্তমান সময়ে এসে কতটা সমসাময়িক, যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য; তা বলে শেষ করা যাবে না। কেননা, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে ভুগছে পুরো বিশ্ব। দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সামাজিক আন্দোলন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ,সেচ ও নিষ্কাশন,নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ,ব-দ্বীপ উন্নয়ন,ভুমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ,রেগুলেটর,স্লুইজ,খাল,বেড়িবাঁধ,রাবার ড্যাম,বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ,উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ,জলাবদ্ধতা নিরসন,বন্যা প্রতিরোধ,নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ,ভুমি পুনরুদ্ধার সেবাসমূহ প্রদান করে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নাধীন যোগ্য প্রকল্পের ৮০ ভাগই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে। ৬৪ জেলা ছোট নদী, খাল ও জলাশয় খনন ও পুনঃখনন করা হবে। বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ করাই ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর উদ্দেশ্য । এর মূল উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মুল এবং মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া।

মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে জলাশয় ও নদীর পানি দূষিত করছে।পানিদূষণের মাধ্যমে পানির নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।দূষিত পানি ব্যবহারে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হতে পারে।গর্ভবতী মা,নবজাতক,পাঁচ বছরের নিচের শিশু বেশি ঝুঁকিতে থাকে।এতে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা খরচ বেড়ে যায়,তাদের কাজের সময় কমে যায় এবং দারিদ্র্য বাড়তে থাকে।ফসলে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার,শিল্পকারখানার বর্জ্য কারণে মাটি ও পানি দূষিত হচ্ছে মাটির উবর্রতা কমছে ফসল উৎপাদন ও শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে,যা অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রভাব ফেলে।পানিদূষণের কারণে পানিতে বসবাসকারী প্রজাতিগুলোর জীবন হুমকির মুখে পড়ে।পানিতে থাকা প্রাণীগুলোর টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। পানিদূষণ রোধ না করলে পানিতে থাকা প্রজাতি হারিয়ে যাবে অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে গেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড যে কৃষি, তার মূল উৎস পানি। মিঠাপানি দিয়েই কৃষক চাষাবাদ করছেন। অপরিকল্পিত ব্যবহার এবং অপব্যবহার পানির গুণগতমান দ্রুত কমিয়ে দিচ্ছে। এতে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিভাগের পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। কৃষিকাজ এবং অন্যান্য কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভর করার ফলে এর স্তর গড়ে ৭.৫ মিটারের নিচে নেমে গেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে ঢাকা শহরের দুই কোটি মানুষের পানির প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে রাজধানীর অনেক অঞ্চলে পানির স্তর ৭০ মিটার নিচে নেমে

গেছে। আন্তর্জাতিক পানি বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, আগামী ৪০ বছরে বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানির সঞ্চয় প্রায় ৩৮ শতাংশ হ্রাস পাবে। একদিকে বৃষ্টিপাত কমে যাবে, অপরদিকে বর্ষার সময়ও কমে আসবে। ফলে ভূমিকম্প, ভূমিধস ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে বাংলাদেশ।

পানিদূষণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্যও হুমকিস্বরূপ। পানিদূষণ রোধ করা না গেলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়।পানিদূষণ রোধে জমিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার হ্রাস করতে হবে,বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে।প্রতিটি কারখানায় ট্রিটমন্টে প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে, নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা করতে হবে,পরিকল্পিতভাবে নগর পরিকল্পনা,সর্বোপরি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পানিদূষণ রোধ করা সম্ভব।পানিদূষণ মোকাবিলায় জনগণের স্বক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তখনই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অজর্ন করা সম্ভব হবে। মানবসৃষ্ট দূষণের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং প্রাণের বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে।প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশের অবক্ষয় রোধে টেকসই উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।পৃথিবীর প্রাণবৈচিত্র্য টিকে থাকার জন্য পানির ওপর নির্ভরশীল।

পানিদূষণের দায় ও বাস্তবতার জায়গা থেকে পানিকে দূষণমুক্ত করতে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হলেও কিছু ত্রুটি থেকেই যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম ত্রুটি হচ্ছে শিল্পকারখানার বর্জ্য ও পানিকে ট্রিটমেন্ট না করা।পানিতে ভারী ধাতুর বিষক্রিয়া একটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত সমস্যা,যা উদ্ভিদ-প্রাণী বা মানুষ যেসব জীবের সংস্পর্শে আসে তাদের জন্য ক্ষতিকর পরিণতি রয়েছে। ভারী ধাতুগুলো পানিতে বা মাটিতে প্রবেশ করলে তা জমা হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে প্রবেশের (বর্তমানে সবজি ও মাছে পাওয়া যাচ্ছে) মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। মানবদেহে ভারী ধাতুর উপস্থিতি বিভিন্ন অঙ্গ যেমন:স্নায়ুতন্ত্র এবং কিডনির ক্ষতি করতে পারে।

বর্জ্যপানি থেকে দূষক পদার্থ দূর করে পানি শোধন করে নির্দিষ্ট ব্যবহার শেষে পানিকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এটির গুণমানকে আরও উন্নত করা হয়। পানি পুনরুদ্ধার এর পরে সেই পানি পরিবেশের উপর এক ধরনের গ্রহণযোগ্য প্রভাব ফেলে। বর্তমানে ‘বর্জ্য পানি’র ব্যবহার বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সৌদি আরবের সর্বোচ্চ শরিয়া বোর্ড কর্তৃক ১৯৮০ সালে বর্জ্য পানি ব্যবহারের ফতোয়া জারির পর নবায়নকৃত পানি মক্কা ও মদিনার মুসল্লিদের টয়লেটে ফ্ল্যাশিং ও অজুর কাজে ব্যবহার করা হয়। কুয়েত সরকার সে দেশের ১৭শ’ হেক্টর জমিতে রসুন, পেঁয়াজ, মরিচসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করে সুফল পায়। এ ছাড়া ১৯৯৮ সালে জর্ডান সরকার ৭০ মিলিয়ন কিউবিক বর্জ্য পানি দেশের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহার করে, যা দেশের মোট পানি ব্যবহারের ১২ শতাংশ। পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিনের বর্জ্য পানি দিয়ে চাষাবাদ করা জমি থেকে উৎপাদিত বেগুন, মরিচ, আপেল, আঙুর ও সবজি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনায় ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে তা নিরাপদ বলে ঘোষণা করা হয়। সুতরাং বাংলাদেশের পানি সংকট দূরীকরণ ও উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এখন থেকেই বর্জ্য পানি ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ, এটি স্বাস্থ্যসম্মত ও পরীক্ষিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোরের কৃষকেরা পানির সমস্যা কাটাতে কয়েকজন কৃষক শহরের অপরিশোধিত বর্জ্য পানি ব্যবহার করছেন। তবে সেই পানি তারা ব্যবহার করছে তুঁত উৎপাদনে। এ তুঁত সিল্কের শাড়ি উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার পেছনে শিল্প-কারখানার পানি উত্তোলন ও প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যবহারও কোনো অংশে কম দায়ী নয়। দেশের কেবল গার্মেন্ট শিল্পে প্রতিটি জিন্স ধোয়া ও রঙ করার কাজে পানির ব্যবহার হয় ৬০ থেকে ৭০ লিটার। এর পুরোটাই মিঠা পানি। বাংলাদেশের আরএমজি খাতে প্রতিদিন ৪১১ কোটি লিটার পানির প্রয়োজন হয়। প্রতি বছর গার্মেন্ট শিল্পের সুতা ও পোশাকে ডায়িং ও ওয়াশের কাজে ব্যবহার হচ্ছে ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি লিটার পানি। সহজলভ্য ও পয়সা খরচ ছাড়াই পাওয়ার কারণে কত বেশি পানি খরচ করা হলো, তা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। ঢাকা ও এর আশপাশে প্রতি বছর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দুই থেকে তিন মিটার নিচে নেমে যাচ্ছে। এতে একসময় আমাদের ভূগর্ভস্থ পানি অনেক নিচে নেমে যাবে, এমনকি পুরো শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

পৃথিবীর পানিসম্পদের মধ্যে বৃষ্টির পানি সবচেয়ে বিশুদ্ধ, নিরাপদ এবং বিপদমুক্ত। এ পানিতে রাসায়নিক পদার্থ ও লবণ নেই, আছে ভিটামিন। বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও বর্ষাকালে নদীর পানি সংরক্ষণের জন্য যেকোনো স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্থানে পানির সংরক্ষণাগার রাখতে হবে। কারণ ভূগর্ভস্থ পানির ওপর আমাদের নির্ভরতা কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারতের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক রেখা রাধামণির কথায়, বৃষ্টির পানি অনেকটা মধুর মতো। বৃষ্টির পানি খেলে যেসব উপকারিতা পাওয়া যায়: বৃষ্টির পানিতে থাকা অ্যালকালাইন অ্যাসিডিটি কমায় ও হজমশক্তি বাড়ায়;বৃষ্টির পানিতে জমে থাকা অ্যালকালাইন পিএইচ ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি রোধ করে;সংরক্ষণ করে রাখা বৃষ্টির পানি ২-৩ চামচ খেলে পাকস্থলীর সমস্যা দূর হয়; বৃষ্টির পানিতে ঘামাচি দূর হয়। ত্বকের জ্বালাভাব কমে; বৃষ্টির পানি ত্বক ও চুলের জন্য ভাল। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পৃথিবীতে সুপেয় পানির ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। তার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। পৃথিবীতে মোট পানিসম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৪০০ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার (মিসিকেএম)। বাংলাদেশে মোট পানি সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৪০৪ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (বিসিএম)। তন্মধ্যে ভূগর্ভে প্রায় ৫৪.০৪ বিসিএম ও ভূউপরে প্রায় ১৩৫০ বিসিএম । উক্ত ভূপরিস্থ পানি নদ-নদীতে ১০১০ বিসিএম ও বার্ষিক বৃষ্টিপাত হতে ৩৪০ বিসিএম কৃষি খাতে পানি ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত ২০৩০ মিলিমিটার (মিমি)। শহরের সচ্ছল পরিবার গোসলে ৪১% পানি, কমোড ফ্ল্যাশ ও কাপড়চোপড় পরিষ্কারে ২২% এবং বাকি পানি রান্নাবান্নাসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। ঢাকা ওয়াসার এক পরিসংখ্যানে জানা যায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে পারিবারিক মোট চাহিদার প্রায় ১৫-২০% মেটানো সম্ভব। সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং ঘনবসতিপূর্ণ জনসংখার বৃদ্ধির মতো চলমান সমস্যাসমূহ মেটাতে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ একটি পুনঃব্যবহার পদ্ধতি।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ শ্রীলংকার একটি বড় এলাকা শুষ্ক হিসেবে পরিচিত। সেজন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে পানির চাহিদা পূরণ করা হয়। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য শ্রীলংকার গ্রামাঞ্চলে নানা উপায় অবলম্বন করা হয়। এ সংরক্ষণের কাজ ২৬ বছর ধরে চলছে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য পুরো শ্রীলংকায় প্রায় ৪৫ হাজার ছোট-বড় ট্যাংক আছে। এছাড়া পুকুর, কুয়া ও জলাধার পরিষ্কার করা হয় এবং মানুষ এগুলো দূষিত করে না। বিভিন্ন হাসপাতাল, শিল্প-কারখানা ও মন্দিরে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। কলম্বোর মতো বড় শহরগুলোয় পানির প্রধান সরবরাহ আসে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে। এর মধ্যে বৃষ্টির পানি একটি বড় উৎস।

বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে পুনরায় ব্যবহারের নিমিত্ত পানির জলাধার/ট্যাংকে সংরক্ষণ করা।এর জন্য তেমন কোনো প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়না। যে কেউ চাইলেই এটা করা যায়,প্রয়োজন সচেতনতা।উক্ত সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য-ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ,যাতে একটি বাস্তুতন্ত্র হতে বিশুদ্ধ পানির অপসারণ তার প্রাকৃতিক প্রতিস্থাপন হার অতিক্রম না করে;বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ যেখানে মানুষের পানির ব্যবহার কমিয়ে অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া।

বৃষ্টির পানি সংগ্রহ তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্বের কোন এক সময়ে ব্যালুচিস্তান (পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানের অংশ) এবং ভারতের কুচ প্রদেশে কৃষক সম্প্রদায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও গৃহস্থালি কাজ সম্পাদন করে। পানি সম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশেষ করে কৃষি উৎপাদন ও সেচের ওপর চাপ বেড়েছে। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ এবং পানি সংকট নিয়ন্ত্রণ একটি ক্রমবর্ধমান কঠিন সমস্যা হয়ে উঠেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় দেশের দুর্গম উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় ক্ষুদ্র,প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক/নৃ-গোষ্ঠী, যাদের বাড়িতে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ খাবার পানির কোন সুযোগ নেই,সেসকল এলাকায় নির্দিষ্ট আকার ও ডিজাইনের বৃষ্টির পানি সংগ্রহ অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকে। বৃষ্টির পানি সংগ্রহের সরঞ্জামাদি সংযোজনের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। উপকূলীয় দুর্গম এলাকার হতদরিদ্র মানুষগুলো সবসময় দৃষ্টি সীমার বাহিরে থাকে। তাদের পক্ষে নলকূপ স্থাপন করে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি পান করা সম্ভব হয় না।বৃষ্টির পানিসংরক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে ২১০৪টি অবকাঠামোর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছে। এতে দুর্গম উপকূলীয় এলাকার প্রায় দশ হাজার মানুষের পানীয় জলের সমস্যা দূরীভূত করা সম্ভব হয়েছে।

জীব ও পরিবেশ নয়,পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় পানি একটি অমূল্য সম্পদ। এ পানিসম্পদকে সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশের প্রতিটি অঞ্জকে বর্তমান সরকারের ভিশন-২০৪১ ও বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে। তবেই দেশ সোনার বাংলায় পরিণত হবে বলে আশা করি।

#

লেখক:সিনিয়র তথ্য অফিসার জনসংযোগ কর্মকর্তা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

পিআইডি ফিচার